যুগান্তর

তারিখ 16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এ কে এম শাহনাওয়াজ

পাঠক্রমে পুনর্বিন্যাস জরুরি

বৈশ্বিক দৃষ্টিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উৎস নিয়ে একটু কাজ করার আগ্রহ ছিল আমার। ২০০৯ সালে এ বিষয়ের ওপর আমার একটি ছোট্ট বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় দেড় দশক ধরে ধর্মের নামে এক ধরনের উগ্র সন্ত্রাসবাদের চর্চাও শুরু হয়েছে এদেশে। প্রথমদিকে আফগানিস্তানে তালেবান এবং মধ্যপ্রাচ্যে আল কায়দা নামে উগ্র জঙ্গিবাদী দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। শোনা গিয়েছিল, তখন বাংলাদেশ থেকে উগ্রবাদী মানসিকতার কিছুসংখ্যক তরুণ আফগানিস্তানে গিয়ে তালেবানদের দলভুক্ত হয়েছিল। ওরা বুঝতে পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা পাওয়ার জন্য তালেবান আমেরিকারই তৈরি। আল কায়দার সঙ্গেও সম্পর্ক হয়েছিল আমাদের এ ধারার তরুণদের। তারা কেউ কেউ নাকি ফিলিস্তিনেও যুদ্ধ করেছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের একটি যোগসূত্রও এদের সঙ্গে থাকে। এসব প্রশিক্ষণ পাওয়া তরুণ দেশে ফিরে জঙ্গিবাদের গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে থাকে। এর সূত্র ধরে আমরা বাংলা ভাই, শায়খ আবদুর রহমানদের উত্থান দেখি। উত্থান ঘটে জেএমবি নামের সংগঠনের। পাশাপাশি হিযবুত তাহরির, হুজি, আনসারউল্লাহ বাংলা টিম, ইসলামী ছাত্রশিবির ইত্যাদি সংগঠনের ব্যানারে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে দেখি। ধর্মের নামে চরম অধর্ম করে হিংসা ছড়িয়ে দিতে থাকে এসব সংগঠনের সদস্যরা। গোপনে অনেক তরুণকে বিভ্রান্ত করে অন্ধকারের চোরাবালিতে টেনে আনা হয়। ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায় মগজ ধোলাই করা হয়। এদের হাতে তুলে দেয়া হয় মারণাস্ত্র। ধর্মের নামে মানুষ খুনের দীক্ষা দেয়া হয়। আন্তর্জাতিকভাবে আল কায়দা সংগঠনটি কিছুটা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর এখন মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক আইএসের দাপুটে অবস্থান। পাশাপাশি এদেশে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গিবাদী দলগুলোর সংগঠিত আক্রমণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথমদিকে এরা বিচ্ছিন্নভাবে ব্লগার, মুক্তচিন্তার লেখক, প্রকাশক, নিরীহ খ্রিস্টান ও হিন্দু পুরোহিত হত্যা করে। এরপর আমাদের চমকে দিয়ে এরা গুলশানে সবচেয়ে কড়া গোয়েন্দা নজরদারির জোনে এক স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টে আক্রমণ করে বিদেশীসহ ২০ ব্যক্তি ও দু'জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ প্রায় ২৫ জনকে হত্যা করে। সেনাবাহিনীর কমান্ডো অভিযানে জঙ্গিরাও নিহত হয়। এর রেশ না কাটতেই কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ঈদ জামাতে মুসল্লিদের মারার জন্য আসা তরুণরা পুলিশের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। এতে বেশক'জন পুলিশ সদস্য আহত-নিহত হন। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এক জঙ্গি। ধরা পড়ে আরও চারজন।

এসব ঘটনা আমাদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। আমি ভাবছি আমার প্রকাশিত বইটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ বিষয়টি যুক্ত করে বড় কলেবরে একটি গ্রন্থ রচনা করব। এই লক্ষ্যে কিছু তথ্য অনুসন্ধান করতে হচ্ছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন আমি প্রথম সারির একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছি। ফলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্মীয় সন্ত্রাসী হওয়ার প্রবণতা কেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করেছি। ফলে কিছুটা সত্য আমার কাছে উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমান লেখাটি এই আলোকেই রচিত।

এ সীমিত পরিসরে হয়তো বিস্তারিত লেখা যাবে না, তবু পর্যবেক্ষণের নির্যাসটুকু উপস্থাপন করা যেতে পারে। তরুণদের সন্ত্রাসী বানানোর পেছনে কয়েকটি কারণ সক্রিয় থাকে, যেমন— ১. শৈশব থেকে পারিবারিক শিক্ষার অভাব, ২. ধর্মের মানবিক দিকগুলো না জানা এবং নিজ ধর্ম ও ধর্মের দর্শন উপলব্ধি করতে না পারা, ৩. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে না পারা, ৪. দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ও প্রশাসন, ৫. ক্ষমতালোভী অসুস্থ দোষারোপের রাজনীতি, ৬. মাদ্রাসা ও ইংরেজি মাধ্যম এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ণ পাঠক্রম এসব ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিবাদ কাজ করে না। ফলে জঙ্গিবাদের প্রচারকরা খুব সহজে এদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এ সত্যটিও মানতে হবে, সাধারণ ধারায় পড়া এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে যে উগ্রবাদ জায়গা করে নিচ্ছে না, এমন নয়। তবে এ প্রসঙ্গটি আজকের আলোচনায় যুক্ত করতে চাই না।

আমি ওপরে উল্লিখিত ৬ নম্বর বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই। গুলশান ট্রাজেডির পর থেকে অনেকে বিস্মিত হয়ে বলছেন— লিখছেন যে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের না হয় সহজে ধর্মের নামে সন্ত্রাসী বানানো গেল। ওদের দারিদ্র্য, পারিপার্শ্বিকতা, মেধা-দুর্বলতা এসব হয়তো কারণ হতে পারে; কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ধনাঢ্য পরিবারের শিক্ষিত ছেলেটি কেমন করে

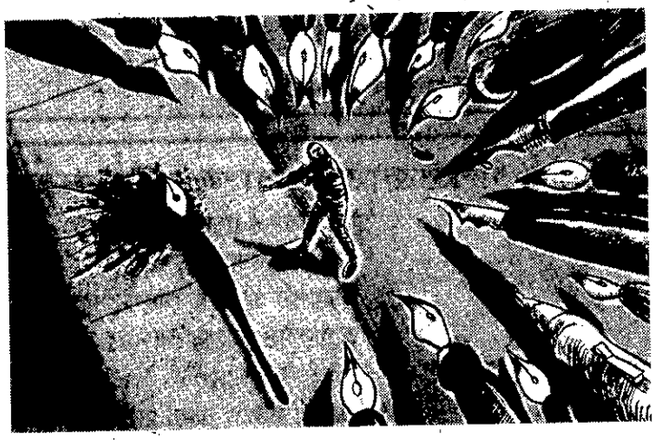

জঙ্গিবাদের দীক্ষা নিয়ে মানুষ খুন করছে? একটু অনুসন্ধানী চোখে তাকালে দেখা যাবে উভয়েরই শিক্ষা সংকট অভিন্ন। আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিশেষ করে কওমি ধারার মাদ্রাসায় যুক্ত হয় দরিদ্র ও স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের সন্তানরা। পারিবারিকভাবে এরা কিছুটা ধর্মপ্রবণ; কিন্তু গভীরভাবে ধর্মচর্চা করা বা হাদিস-কোরআনের আলোকে ধর্ম সম্পর্কে গভীর ধারণা নেয়ার সুযোগ তাদের অনেকেরই হয়নি। শৈশবে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে। পারিবারিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়নি। লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে খেয়েছে এবং থেকেছে। শিক্ষকদের কঠিন শাসনের ভেতর অনেকেরই স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটেনি। আমি জেনে অবাক হয়েছি অনেক কওমি ধারার মাদ্রাসায় পত্রপত্রিকা পড়াও নিষেধ। পড়লে শাস্তি পেতে হয়। খুবই সীমাবদ্ধ সিলেবাস। তাতে জাগতিক বিষয়াবলির উপস্থিতি সীমিত। আমাদের দেশের মাদ্রাসা কারিকুলামের অসম্পূর্ণতা শিক্ষার্থীর মধ্যে যেভাবে বদ্ধবুদ্ধির জন্ম দিচ্ছে, তাতে এদের ভেতর থেকে নির্বাচিত তরুণদের ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে জঙ্গিওয়ালা জঙ্গি বানাতে পারছে।

আমাদের দেশের ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর কারিকুলাম লক্ষ্য করি। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষার কারিকুলামের প্রভাব থাকলেও দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য জানার সুযোগ নেই বললেই চলে। এদেশের মুসলমান ঐতিহ্যগতভাবে যে ধার্মিক এবং অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মনোভাবাপন্ন সে সত্য এদের জানা হয়ে ওঠে না। পারিবারিক শিক্ষা এ ঘাটতি কিছুটা মেটাতে পারত। কিন্তু অনেক ধনাঢ্য পরিবারের বাবা-মা নিজেদের ব্যস্ততার কারণে সন্তানকে সানিধ্য দিতে পারেন না। তার বদলে তিনটে কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দেন। আমাদের অনেক কোচিং সেন্টারের পরিচালনায় জামায়াত-শিবিরের নিয়ন্ত্রণের কথা শোনা যায়। ইতিহাস-ঐতিহ্যচর্চা বিচ্ছিন্ন বলে জঙ্গিবাদী অশুভ শক্তি এদের অনেককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। ধর্মের মূল শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে আড়াল করে সংকীর্ণ ব্যাখ্যায় এদের মগজ ধোলাই করে। বিভ্রান্ত করে জান্নাত লাভের সরল পথ দেখিয়ে। কোচিং সেন্টার থেকে কারও কারও মনোজগতে পরিবর্তন ঘটানো হতে থাকে। এদেরই অনেকে মামি-দামি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ইদানীং বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক বেশি ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এদের বড় অংশই সাধারণ ধারার স্কুল ও কলেজ থেকে পড়ে এসে ভর্তি হয়ে থাকে। আমি লক্ষ্য করেছি এ পর্যন্ত যারা জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তাদের বেশিরভাগ এই সাধারণ ধারা থেকে আসা শিক্ষার্থী নয়। প্রায় সবাই ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে পড়ে আসা।

এ ধারার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বড় সংকট কারিকুলাম ও শিক্ষাপদ্ধতি। অধিকাংশ বড় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তর আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের সঙ্গে পার্থক্য হল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টি করা। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বাজারমুখী। শিক্ষার্থীদের কর্পোরেট জগতে পৌঁছে দেয়া। কঠিন একাডেমিক রুটিনে বাঁধা তিন মাসের সেমিস্টার (কোথাও ৬ মাসের)। প্রতি সেমিস্টারে একজন শিক্ষার্থী ৩ থেকে ৪টি কোর্স নিয়ে থাকে। কেউ ৫টাও নেয়। ৪টা কোর্স ধরলেও দেখা যাবে শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ১২টি কুইজ, ৮টি মিডটার্ম, ৪টি কোর্সে ৪টি ফাইনাল দিতে হয়। এছাড়াও রিপোর্ট, টার্মপেপার, প্রেজেন্টেশন এসব তো আছেই। ফলে চাইলেও একজন শিক্ষার্থীর লাইব্রেরিতে গিয়ে জ্ঞানচর্চা করা বা মনের আনন্দে সাহিত্য পাঠ করার সময় থাকে না। হ্যান্ডআউটনির্ভর চর্চায় জ্ঞানের গভীরে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। পুরো সেমিস্টারে পরীক্ষা প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ও পাঠক্রম যেভাবে বিন্যস্ত, তা থেকে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানার সুযোগ খুবই কম। আমি একযুগ আগে এমন প্রথম শ্রেণীর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়ে দেখলাম বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান কোথায় আমাকে প্রথম চেনাতে হল। পাহাড়পুর বিহার বা ময়নামতি প্রত্নস্থল সম্পর্কে খুবই অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে ওদের। ষাটগম্বুজ মসজিদ আর ছোট সোনা মসজিদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে না। আমি যখন বললাম এই যে বাংলাদেশকে মুসলমানের দেশ বলছ তা ঠিক নয়। বুঝলাম শুনে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হল। বললাম বলতে পার এখন বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ১১ শতকের আগে এদেশে মুসলমান ছিলই না বলা যায়। এদেশ ছিল একসময় বৌদ্ধ ও একসময় হিন্দু অধ্যুষিত। বহিরাগত সুফিরা ধর্মপ্রচার করায় মানুষ ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিত হয়। তের শতক থেকে বহিরাগত তুর্কি সুলতান ও পরে মোগলদের হাতে চলে যায় রাজদণ্ড। এরপর ইসলাম প্রচার গতি পায় অহিংসার পথে। আল্লাহর প্রতি প্রেম ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা বলে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সুফি সাধকরা। ইসলামের এই মানবিক আবেদন আকৃষ্ট করেছিল এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে। কিন্তু মাদ্রাসা, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামে ইতিহাসের এই সত্য জানার সুযোগ নেই। আরও একটি আশংকার কথা, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংবাদপত্র পড়ার প্রবণতাও খুব কম।

এভাবে দুর্বল শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একদিকে যেমন সুকুমার বৃত্তি জাগাতে পারছে না, তেমনি তা দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমহীন বদ্ধবুদ্ধির নাগরিক তৈরি করছে। আমরা মনে করি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব স্তরে যদি সাহিত্য, ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং কোরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামের মানবিক শিক্ষা জানার সুযোগ হতো, তবে জঙ্গিবাদী জ্ঞানপাপী দীক্ষাগুরুদের পক্ষে শিক্ষার্থীদের ধর্মের নামে সন্ত্রাসী বানানো সহজ হতো না। সম্প্রতি ইউজিসি সব ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' এবং 'বাংলা ভাষা' ধরনের কোর্স বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে। এটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' বিষয় দিয়ে দেশ ও ঐতিহ্য জানার খুব সীমিত সুযোগই সৃষ্টি হতে পারে। প্রয়োজন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবিষয়ক কোর্স বাধ্যতামূলক করা। যা পাথরযুগ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। নির্বাচিত বিষয়ের আলোকে পাঠক্রম বিন্যাস করে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও প্রত্নঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া সম্ভব।

এসব বাস্তবতায় আমরা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের কাছে অনুরোধ রাখব, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলাম সংস্কার করে ওপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষাপদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। পরিবার যদি সতর্ক থাকে, পারিবারিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে যদি সাহায্য করে এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম যদি জীবনমুখী হয়— ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করতে পারে, তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবাদী মনের বিকাশ ঘটবে। এতেই যে জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে তেমন নয়। তবে সচেতন তরুণদের মগজ ধোলাই করা অনেকটা কঠিন হয়ে পড়বে।

এ কে এম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com